

Vol. 37 | No. 2 | 1994

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ডক্টর সুশীল কুমার দে

Volume	37
Issue	2
Year	1994
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ভবতোষ দত্ত
Published online	February 1, 1994
DOI	10.62328/sp.v37i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v37i2.1
Pages	9-28
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৭ : সংখ্যা ২

Check for updates

ডক্টর সুশীল কুমার দে

ভবতোষ দত্ত

ডক্টর সুশীলকুমার দে (১৮৯০-১৯৬৮) ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পর্যায়ের শিক্ষকদের অন্যতম। ১৯২৩ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত তিনি ছিলেন এ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের প্রধান। ইংরেজিতে অনার্স ও এম.এ. এবং লন্ডন স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এর ডিলিট ডিগ্রিধারী ডক্টর দের পি. আর. এসের থিসীস History of Bengali Literature in the Nineteenth Century 1800-1825 -এর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের যে গোড়াপত্তন করেছিলেন, এখনও সেটা অটুট। তাঁর সম্পাদিত সংস্কৃত *ক্লাসিকস* আদর্শ পদ্ধতি, রীতির অনুসরণ ও পাণ্ডিত্যে আজও অনতিক্রান্ত। বাঙালির জীবনে ও সংস্কৃতিতে তাঁর আগ্রহ ও অনুসন্ধানস্পৃহা ছিল অক্লান্ত। সুশীলকুমার বাংলা প্রবাদের যে সংকলন করেছিলেন সেটা তার স্থায়ী কীর্তি বলেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর সৃষ্টিশীল রচনার মধ্যে ছিল সনেট ও অন্যান্য কবিতা।

প্রাক্তন রবীন্দ্র অধ্যাপক, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ

ডক্টর সুশীলকুমার দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন ১৯২৩ এ-এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার দু'-বছর পর। নবস্থাপিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, ইংরেজির পণ্ডিত ডক্টর মাহমুদ হাসান, বাংলা-সংস্কৃতের ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতো বিখ্যাত জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে এসেছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সংস্কৃত-বাংলা বিভাগের প্রধান। সেই সময় সুশীলকুমার ইংরেজির অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে আসেন। তাকে আমরা জানি সংস্কৃত সাহিত্যের পণ্ডিত বলে, কিন্তু তাঁর এম-এ ডিগ্রি ছিল ইংরেজিতে। ইংরেজি অনার্স (১৯০৯) এবং এম.এ (১৯১১) দুয়েতেই তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ১৯২৩ পর্যন্ত তিনি কলকাতায় প্রেসিডেন্‌সি কলেজে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যই পড়িয়েছেন।

ইংরেজি অধ্যাপনা তখন তার ছিল বৃত্তি; তাঁর অনুরাগ ছিল সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যচর্চায়। তিনি লিপ্ত হয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের গবেষণায় এবং সংস্কৃত কাব্যানুশীলনে। প্রথমটির ফল বাংলা সাহিত্যের ছাত্র মাত্রেরই সুপরিচিত বিখ্যাত বই *History of Bangali Literature in the Nineteenth Century, 1800-1825* । এটা বেরিয়েছিল ১৯১৯ এ। এটা ছিল সুশীলকুমারের পি আর এসের *থিসীস*। আজ পর্যন্ত উনিশ শতক নিয়ে বহু বই বেরিয়েছে, ভালো গবেষণা হয়েছে, কিন্তু সুশীলকুমার সেকালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারের পুরনো বই ঘেঁটে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের যে গোড়াপত্তন করে দিলেন আজও সেটা অটুট। আশ্চর্যের বিষয় ইংরেজি সাহিত্যের এই অধ্যাপক এবং বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী গবেষক এর পরেই বিলেতে চলে গেলেন বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত এল ডি বারনেটের সঙ্গে কাজ করবার জন্য। সেবার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও বিলেতে গেলেন বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে কাজ করবার জন্য ১৯১৯-এ। তাঁরা দুজনেই লণ্ডন স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে গবেষণা শেষ করে ডিলিট ডিগ্রি পেলেন ১৯২১-এ। সুশীলকুমার কাজ করেছিলেন সংস্কৃত রসশাস্ত্রের ইতিহাস এবং তত্ত্ব নিয়ে। তার বইয়ের নাম *Studies in the History of Sanskrit Poetics* (দুই খণ্ড)। ১৯২১-এ তিনি জার্মানীর বন-এ যান হারমান জ্যাকবির কাছে পাঠ সংস্কার এবং পুথি সম্পাদনা সম্পর্কে শিক্ষা নিতে। তাঁর এই শিক্ষা যে কত ফলপ্রসূ হয়েছিল, কুন্তকের *বক্রোক্তিজীবিত* এবং পরবর্তীকালে সংস্কৃত *মহাভারত* ইত্যাদি সংস্কৃত *ক্লাসিকসের* সম্পাদনা থেকেই তা প্রমাণিত। আদর্শ পদ্ধতি এবং রীতির অনুসরণে পাণ্ডিত্যে এসব কাজ আজও অনতিক্রান্ত। তার কাজ সম্বন্ধে বারনেট লিখেছিলেন :

The author deals with the Sanskrit art of poetry, a subject which has a wide literature and abstruse technique, but his treatment of it shows a complete mastery of the whole field of stylistic and has made a distinct contribution to the history of ancient Indian literature.

১৯২৫-এ ডক্টর দের যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত-বাংলা বিভাগে রীডার নিযুক্ত হওয়ার কথা হল, তখন এফ ডব্লিউ টমাস লিখেছিলেন :

Dr. Sushil Kumar De became first known to me in 1919, when he came to London as an accepted candidate for the Degree of D. Lit. He brought with him his *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century*, an excellent work in which first-hand investigation is combined with sound literary judgment and unusual command of the English *idiom*. I had some occasion to follow his studies for the D. Lit, and also subsequent reading with that admirable scholar, Prefessor Jacobi of Bonn who conceived a high opinion of him. The outcome may be seen in Dr. De's edition of *Kuntaka's Vakrokti Jivita* and his *Studies in the History of Sanskrit Poetics* now completed in two volumes.

এই চিঠিখানা টমাস লিখেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্যকে। ১৯২৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ডক্টর দে সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। আগে সংস্কৃত ও বাংলা একটিই বিভাগ ছিল। ১৯৩৭-এ দুই বিভাগ আলাদা হয়ে গেল, বাংলা বিভাগের প্রধান হলেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সংস্কৃত বিভাগের প্রধান রইলেন ডক্টর দে। তখন বাংলা বিভাগে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, গণেশচরণ বসু, আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ সুপরিচিত ব্যক্তিগণ অধ্যাপনা করতেন। শেষোক্ত দুজন ছিলেন বিভাগেরই ছাত্র। মোহিতলালকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে সাহায্য করেছিলেন বন্ধু সুশীলকুমার। চারুচন্দ্রের মতো মোহিতলালও ছিলেন শুধু বি.এ. পাশ। তিনি তখন কবিখ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু সমালোচক-খ্যাতি তখনও হয়নি। ১৯২৭-এ ঢাকায় আসার পর তিনি বিশেষভাবে সাহিত্য সমালোচনায় মনোনিবেশ করেন। এখন সকলেই জানেন তার সমালোচক-খ্যাতি কবি খ্যাতির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এরা সবাই থাকাতে বাংলা বিভাগের একটি উজ্জ্বল

ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। ১৯৪৫ এ ডক্টর শহীদুল্লাহ অবসর নিলে ডক্টর দে আবার বাংলা বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। শহীদুল্লাহ, সুশীল দে, মোহিতলাল মিলে বাংলার যে পাঠক্রম রচনা করেছিলেন, তার বৈশিষ্ট্য ছিল ভাষা, ইতিহাস, পুথিপাঠ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র পর্যন্ত অধ্যয়ন।

ছাত্রদের মধ্যে *ক্লাসিক*প্রীতি সঞ্চারিত করার প্রতি তার যেমন বিশেষ আগ্রহ ছিল, ডক্টর দের নিজের অনুসন্ধান ও গবেষণাও অব্যাহত ছিল এই দিকেই। ঢাকায় থাকতেই বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বই লেখেন। বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতিতে তাঁর আগ্রহ ও অনুসন্ধান স্পৃহা ছিল অক্লান্ত। ঢাকায় থাকতেই তিনি বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস রচনায় মগ্ন হলেন। তার *Early History of Visnava Faith and Movement* ১৯৪২ এ বেরিয়েছিল। এই বইতে তিনি চৈতন্য অনুসৃত বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস রচনা করেন। সেই সূত্রে বৃন্দাবন গোস্বামীদের রচিত সংস্কৃত ভক্তিশাস্ত্রের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছেন। এ বইয়ের কাজ আরম্ভ হয়েছিল কয়েক বছর আগেই। রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলী তিনি সম্পাদনা করেছিলেন (ইংরেজিতেই) ১৯৩৪-এ। তার দীর্ঘ তত্ত্ববিশ্লেষণাত্মক ভূমিকাটি ডক্টর দের মনীষার পরিচায়ক। তাতেই প্রসঙ্গত তিনি লিখেছিলেন বৈষ্ণব ধর্মের পরিকল্পিত ইতিহাসের কথা। কিন্তু এই সময়ে যে কাজটি আন্তর্জাতিক পণ্ডিত সমাজে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করেছিল তা হচ্ছে ব্যাসরচিত *মহাভারতের* উদ্যোগ পর্ব সম্পাদনা। সারা ভারতে প্রচারিত মূল মহাভারতের বিভিন্ন পাঠ মিশিয়ে একটি *ক্রিটিক্যাল* সংস্করণ প্রস্তুত করার প্রকল্প গ্রহণ করেছিল পুণার ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট। এতে সমগ্র ভারতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা নিযুক্ত হয়েছিলেন বিভিন্ন কেন্দ্রে। ডক্টর দে ছিলেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম। ঢাকা থেকে অবসর নেওয়ার পর আর একবার তিনি এই ভার গ্রহণ করেছিলেন- দ্রোণপর্ব সম্পাদনায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তার বিশেষ স্থায়ী কাজ ছিল এর বিরাট পুথিশালা গড়ে তোলা। এ কাজে বিখ্যাত ঐতিহাসিক নলিনীকান্ত ভট্টশালীরও সহায়তা ছিল। এই প্রসঙ্গে সেকালের পুথি বিশেষজ্ঞ সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও স্মরণীয়।

ডক্টর দের কাজ প্রধানত ইংরেজি ভাষাতেই নিবদ্ধ। বাংলা ভাষায় লেখা তার কাজের পরিমাণ সেই তুলনায় কম। *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়* এবং *প্রবাসীতে* তাঁর বহু মূল্যবান প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে। তার একটি নির্বাচিত সংকলন *নানা নিবন্ধ* বেরিয়েছিল ১৯৫৩ তে। যে কোনো পাঠকই এতে সংকলিত আলোচ্য বিষয়ের পরিধি দেখে বিস্ময় বোধ করবেন। বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্মবাদিনী থেকে চৈতন্য সম্প্রদায়, নাটুকে রামনারায়ণ, বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিনী, মধুসূদন ও বাংলা মহাকাব্য

প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় সমাহৃত হয়েছে নানা নিবন্ধে। তার কতকগুলি তথ্যমূলক, কতকগুলি বিচার্যমূলক। সুশীলকুমার বাংলা প্রবাদের যে সংকলন করেছিলেন বাংলা সাহিত্যে সেটা তার স্থায়ী কীর্তি বলেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইদানীং লোকসাহিত্যচর্চা যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেনের পর সুশীলকুমার তার পথিকৃৎ। ঢাকায় থাকতেই বাংলা প্রবাদ সংকলন করে তিনি তার সূচনা করে গিয়েছেন। এর অত্যন্ত সুলিখিত দীর্ঘ ভূমিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল *শনিবারের চিঠিতে*।

এসব ছাড়া বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আর একদিক দিয়ে তার যোগের কথা অনেকেরই হয়তো জানা নেই। সুশীলকুমার প্রথম যৌবন থেকেই কবিতা লিখতেন। মূলত তিনি ছিলেন প্রেমের কবি। তার কবিতার মার্জিত পরিশীলিত গাঢ়বন্ধ ভাষা সংস্কৃত কাব্যকথাকেই স্মরণ করিয়ে দেয় যদিও প্রেমানুভূতির গাঢ়তা ব্রাউনিঙের সঙ্গেই তুলনার যোগ্য। একমাত্র *সামন্তনী* ছাড়া অন্য পাঁচটি কবিতার বই বেরিয়েছিল সেই সময়ে, যখন ঢাকায় তিনি গম্ভীর গবেষণায় নিরত।

তাঁর গুরুগম্ভীর গবেষণা নিয়ে ডক্টর দে যে দূরান্তরিত ছিলেন তা নয়। বাংলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় সাহিত্যান্দোলনের সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন। *কল্লোলের* প্রতিবাদ স্বরূপ বেরিয়েছিল *শনিবারের চিঠি*। ঢাকা থেকে সুশীলকুমার এবং মোহিতলাল দুজনেই স্বনামে ও বেনামে তাতে প্রবন্ধ লিখতেন। সুশীলকুমারের ছদ্মনাম ছিল প্রেমমুকুল জানা। তারা দুজনেই আধুনিক সাহিত্যের বিরোধী সমালোচক। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারের দৃষ্টিতে ঢাকার বাংলা বিভাগ ছিল রক্ষণশীল এবং রবীন্দ্রবিরোধী। অবশ্য ঢাকাতেই যে বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, অমলেন্দু বসুর মতো আধুনিকতাপন্থী লেখকরা ছিলেন, সে কথাও সত্য। এদের মধ্যে অজিত দত্ত ছিলেন সুশীলকুমার দের ছাত্র। বুদ্ধদেব বসু তার যৌবনস্মৃতি মন্থন করতে গিয়ে সাহেব সুশীলকুমারের সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের উল্লেখ করেছেন।

জীবনের শেষদিকে আবার তারা একসঙ্গে কাজ করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে সুশীলকুমার ছিলেন বাংলা বিভাগের প্রধান এবং অজিত দত্ত ওই বিভাগের অধ্যাপক। বুদ্ধদেব বসু ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই ছিলেন তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রধান। সুশীলকুমার ১৯৪৭-এ অবসর নিয়ে ঢাকা থেকে চলে আসেন। কলকাতায় তিনি সংস্কৃত কলেজের *রিসার্চ-প্রফেসর* এবং পরে নবস্থাপিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হন।

১৯৬৮র ২৯ জানুয়ারিতে তার মৃত্যু। তাঁর জন্ম হয়েছিল কলকাতায় ১৮৯০র ৩০ এ জানুয়ারি।

সুশীলকুমার দে-রচিত গ্রন্থ

ইংরেজি মৌলিক গ্রন্থ

1. *Bengali Literature in the Nineteenth Century* (1800-1825 A-D) Calcutta University, 1919. revised and enlarged edition extending from 1757 to 1857, Calcutta 1962.
2. *Studies in the History of Sanskrit Poeties.* in two volumes vol. i chronology and sources; vol. ii systems and theories. London 1923, 1925, revised second edition Calcutta 1960.
3. *Treatment of Love in Sanskrit Literature.* Calcutta 1929.
4. *Early History of Vaisnava Faith and Movement in Bengal.* Calcutta 1942.
5. *History of Sanskrit Literature* (prose, poetry and drama) Calcutta 1947.
6. *Aspects of Sanskrit Literature.* Calcutta 1959.
7. *Some Problems of Sanskrit Poetics.* Culcutta 1959.
8. *Ancient Indian Erotics and Erotic Literature* Calcutta 1959.
9. *Sanskrit Poeties as a Study of Aesthetics.* Bombay 1963.

ইংরেজি সম্পাদিত গ্রন্থ

1. *Vakrokti Jivits : a rare treatise on Sanskrit poeties by Rajanaka Kuntaka* (prepared from unpublished Mss. with introduction, critical notes and resume). Calcutta 1923. Revised editions 1928, 1961.
2. *Kicaka-vadha by Nitivarman, a rare yamoaka and slesha kavya with five plates.* Dacca 1929.
3. *Padyavali of Rupa Goswami. An anthology of Vaisnava Sanskrit poems* to which is prefixed an historical and critical introduction on the *Caintanya* Movement and literature. Dacca 1934.
4. *Krsnaz Karunamrta ascribed to lilasuka betvamangala* with three Bengali commentories by Gopala Bhatta

Caitanyadasa and Krisnadas Kaviraja. Dacca 1938.

5. *Udyoga-parvan of the Mahabharata.*Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute 1949.
6. *Jnana-Dipika of Devabodha: the oldest known commentory on the Udyoga Parvan of Mahabharata.* Bomboy 1944.
7. *Meghaduta of Kalidasa.* New Delhi Sahitya Akademi. 1957.
8. *Drona Parvan of the ÈMahabharata.* Poona 1958.
9. *An Anthology of the Epics and Puranas* (Jointly with R.C. Hazra). New Delhi : Sahitya Akadenrim. 1959.

বাংলা মৌলিক গ্রন্থ

১. *দীপালি* (সনেট কাব্য)। কলকাতা ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ

২. *প্রাক্তনী* (কাব্য)। কলকাতা ১৩৪১ বঙ্গাব্দ

৩. *লীলায়িতা* (কাব্য)। কলকাতা ১৩৪১ বঙ্গাব্দ

৪. *অদ্যতনী* (কাব্য)। কলকাতা ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ

৫. *ক্ষণদীপিকা* (সনেট কাব্য)। কলকাতা ১৩৫৩

৬. *দীনবন্ধু মিত্র* (সমালোচনা)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শরৎচন্দ্র স্মারক বক্তৃতা। কলকাতা ১৯৫১. খ্রি.

৭. *নানা নিবন্ধ* (প্রবন্ধসংগ্রহ)। কলকাতা ১৩৫৩

৮. *সায়ন্তনী* (কাব্য)। কলকাতা ১৩৬১

বাংলা সম্পাদিত গ্রন্থ

১. *বাংলা প্রবাদ* (সঙ্কলিত ও দীর্ঘ ভূমিকাসহ সম্পাদিত)। কলকাতা ১৩৫২ বঙ্গাব্দ। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ; কলকাতা ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ। লেখকের মৃত্যুর পর এর তৃতীয় সংস্করণ করেছেন ভবতোষ দত্ত এবং তুষার চট্টোপাধ্যায়।

এক

রবীন্দ্রনাথ কবিতায় বেশ কিছু পুরো গল্প লিখেছেন। এক শ'য়ের কাছাকাছি। কবিতার প্রাচুর্যের মধ্যে সংখ্যাটা তেমন গুরুতর নয়। কিন্তু সংখ্যানুপাতের কথা ছেড়ে দিলে বলতেই হবে, কবিতায় এত গল্প লেখার ব্যাপারটা না ভেবে পারা যায় না, বিশেষ করে যে যুগে এ দায় নিঃশেষে নিয়ে নিয়েছে গদ্যই। এখানে আমি সে-সব কবিতা ধরি নি গল্পাংশ যাতে কবিতার উপাদান কিংবা যখন চরিত্রের কোনো স্থিরচিত্র ঘটনার আবর্তন নিরপেক্ষভাবেই গড়ে তোলে কবিতার ভিত্তি।

পদ্মাতীরে কবি প্রতিভা-বিকাশের প্রথম পর্যায় থেকে শুরু করে জীবনের প্রান্ত পর্যন্ত তিনি গদ্যে এবং পদ্যে গল্প লিখেছেন। কখনও কোনোটা কম কোনোটা বেশি হয়েছে ; তবে তাঁর এই আগ্রহে কখনই ছেদ পড়ে নি।

গদ্যগল্পের পাশাপাশি, আগেপরে এই পদ্যগল্পগুলিও লেখা চলছিল। এ-সব রচনা কবিতা হিসেবে কাব্যগ্রন্থেই স্থান পেয়েছে। লেখক এদের কাব্যপরিচয় থেকে চ্যুত করতে চাননি ঠিকই, কিন্তু সতর্ক পাঠক এদের গল্পত্বও ভুলতে পারবে না। ভোলা উচিতও নয়, তাহলে সম্ভোগে অনেক ফাঁক থেকে যাবে।

অবশ্যই গল্পে-কবিতায় মিশিয়ে শিল্পরীতির বিচিত্র পরীক্ষা এবং স্বাদুতায় নব নব মাত্রার আমদানি রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল। পাঠকের সঙ্গে সংযোগের সর্ববিধ চেষ্টা তিনি করেছেন। জীবনবোধ এবং রূপোভোগের ক্ষেত্রে তাঁর সমাযোজিত করবার জন্য পাঠকচিত্তের ভিন্ন ভিন্ন মহলে যে-সব আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত তাদের উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। গদ্যগল্পকে কখনও লিরিকে সমর্পণ করেছিলেন *'লিপিকা'*য় (২/৩ পর্বে) ; আবার লিরিকের নিজস্ব জগতে গল্পের স্থান করে দিয়েছেন।

কাব্য সেকালে গল্পবলার কাজও করত। সে-সব লেখায় আবেগগাঢ় কল্পনামুখ্য অতীতচারণা। বর্ণ ও বর্ণনার বাহুল্য। সেই আদর্শকে ছোটগল্পের স্বভাবে গুটিয়ে এনে তীক্ষ্ণ সংহত একমুখী করেই কবিতায় গল্পকথনের নতুন সাধনা রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন। এ-প্রসঙ্গে *কথা ও কাহিনী* বইয়ের 'কথা' অংশের কাব্য গল্পগুলি দ্রষ্টব্য। এই সাফল্যের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, উক্ত বইয়ের 'কাহিনী' অংশ থেকেই তিনি গদ্যগল্পের সমধর্মী বিষয় নিয়ে, বর্তমানের প্রসঙ্গত কাব্য-গল্পে বলতে থাকেন। এ কালের সমাজকে-জীবনকে তাদের রূঢ় বাস্তবতা নিয়েও যে কবিতায় লেখা গল্পে ধরে রাখা যায়, এটা প্রমাণিত হল। গদ্যগল্পের চেয়ে এদের রকম-সকম কিছু পৃথকই হল! স্বাদ এবং কমিউনিকেশনের ধরনও ১।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিকবিতায় রোমান্টিক সৌন্দর্য-ব্যাকুলতা এবং নিসর্গরহস্যের সন্ধানের মধ্যেও মর্ত্যজীবনের প্রীতিতে সুস্থিত থেকেছেন এবং বহুসংখ্যক কবিতায়

সমাজবাস্তবতা, রাজনৈতিক ভাবনা, সংসারের নানা প্রসঙ্গ, ঘটনাশ্রয়ী গল্পকথন, ব্যক্তিচরিত্রের নির্মাণ প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থেকে লিরিকের অনির্দেশ্য আকাশচারিতাকে মধ্যাকর্ষণে বেঁধেছেন। প্রমথ চৌধুরী কৌতুকের সুরে লিখেছিলেন :

মনোগুড়ি বুঁদ হলে ছাড়ি নে লাটাই।

রোমান্টিক কল্পনার দিকেই তাঁর কটাক্ষ, শিল্প-প্রবণতায় যতই স্বাতন্ত্র্য থাক, রবীন্দ্রনাথের এই সব কাব্যগল্পে সেই লাটাইয়ের মৃত্তিকামুখী বন্ধনই।

এই প্রবন্ধে ঐ জাতীয় কয়েকটির পরিচয় দেব - কয়েকটি মাত্র কবিতা-গল্পের যেখানে সমাজ-চিন্তা সরাসরি ঢুকে পড়েছে।

দুই

কথা ও কাহিনী কাব্যের 'কাহিনী' অংশ তিনটি-'পুরাতন ভৃত্য', 'দুই বিঘা জমি' 'দেবতার গ্রাস' এবং *চিত্রা* কাব্যে সঙ্কলিত একটি 'বিসর্জন'। ১৮৯৩ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে লেখা এই পদ্যগল্প কটিতে প্রথম সামাজিক জীবন প্রত্যক্ষত ধরা দিল। এর আগে, *কথা ও কাহিনীর* 'কথা' অংশ বৌদ্ধকাহিনী, মারাঠী, শিখ-রাজপুতদের কীর্তি এবং ভক্তদের মহিমার কথা বলায় রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত ছিলেন। এই সব গল্প যেন কবিতায় না বললেই নয়- তাদের মধ্যে বীরত্ব ত্যাগ ভক্তি প্রভৃতি আদর্শবাদের সুর এমনই উচু তারে বাঁধা।[২] এবারে কবি এমন সব বিষয় বাছলেন যা মাটির কাছাকাছি, মাঝে মাঝে সমাজ-সমস্যার অনেক গভীরে ঢুকে যাবার মতো।

'পুরাতন ভৃত্য' বাঙালি পরিবার-জীবনের একটি পরিচিত ছবি। প্রভু-ভৃত্যের সুনির্দিষ্ট হিসেবি সম্পর্কের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির যে মাত্রাটি তিনি এনেছেন সমকালীন বাঙালি জীবনে তা অস্বাভাবিক ছিল না, যদিও এখন তা আর সুলভ নয়। মনিব-চাকরের স্বার্থদ্বন্দ্বের উপরে পুরনো দিনের রঙের প্রলেপ আজ প্রায় সবটাই উঠে গিয়েছে। কঠিন সত্য আর ঢাকা নেই। তাই বলে ঢাকাদেওয়া যে রূপটা সেকালে ছিল তাকে অবাস্তব বললেই সত্যের সাধনা না।

কাছাকাছি সময়ে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' নামে একটি গদ্য গল্প তিনি লিখেছিলেন। দু-একজন সাহিত্যভাবুক চাকরের হৃদয়বৃত্তির বাহুল্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। পশ্চিমে নাকি এর সমতুল্য কিছু কখনও মেলে না। এরূপ আরোপিত চিন্তাকে অস্বীকার করার জন্য যুক্তি দেবার প্রয়োজন দেখিনা। 'পুরাতন ভৃত্যে' লেখক জীবনের ছবি এঁকেছেন -আমাদের পরিবার জীবনে পুরনো দিনে যেমনটি ছিল;

'ভৃত্যজীবনের বাঙালি আদর্শ' নির্ণয়ের বালসুলভ চেষ্টা করেন নি। এ লেখায় চাকরকে তিনি চাকরই রেখেছেন। তার অকর্মণ্যতা এবং নির্বুদ্ধিতা নিয়ে গৃহিণীর ক্রোধ এবং কর্তার কিছু প্রশ্রয়-মিশ্র তিরস্কার। ঐ বোকা চাকরটি কিন্তু সম্পর্কের সীমা ডিঙিয়ে বাবুকে ভালোবেসেছিল। বাবুকে বাঁচাতে গিয়ে সে রোগে পড়ল এবং মারা গেল। অকাজের এই নির্বোধ চাকরটি হৃদয়বত্তায় অনায়াসে ছাড়িয়ে গেল সেই সব ভদ্রলোককে যারা বাবুর সঙ্গে আমোদ করার জন্য দেশভ্রমণে এসেছিল। বাবু দুরন্ত বসন্ত রোগে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর দল 'বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ'। চাকর কেষ্টা মনুষ্যত্বের গৌরবটুকু ধরে রাখল-এবং তা কোনা সেবাধর্মী আদর্শবাদের প্রভাবে নয়, অবোধ প্রীতিতে যা হয়ে পড়েছিল তার বেহিসেবী অস্তিত্বের অচ্ছেদ্য অংশ। গদ্যগল্প খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনের রাইচরণ কল্পরাজ্যের বাসিন্দা, তার চারপাশে চড়া *সেন্টিমেন্ট* ও অবিশ্বাস্য নাটুকেপনা। পারিবারিক ঘটনার বিস্তারত্ত গল্পকে অবাস্তবতা থেকে বাঁচাতে পারে নি। 'পুরাতন ভৃত্য' ঘটনা-বিরল, যেটুকু আছে মাত্র উল্লেখে, বাড়াবাড়ি নেই কারুণ্যের, একটি দীর্ঘশ্বাসে মাত্র সংহত। সব নিয়ে লেখাটি বাস্তবতায় অবিচল।

'দুই বিঘা জমি'তে লেখকের সমাজমনস্কতা আরও গাঢ়, তীক্ষ্ণ কবিতায় লেখা বলে এর বাস্তবতার মুঠি কোথাও আলগা নয়। তথ্যগত অনুপুক্ষ বিবরণ না থাকলেও, জমিদারী শোষণ-পীড়নের সুনির্দিষ্ট প্রসঙ্গ আছে বাগানবাড়িকে চৌখস করার জন্য উপেনকে তার শেষ সম্বল দুবিঘা জমি থেকে উৎখাত করল জমিদার, মিথ্যা দেনার-জাল খত দেখিয়ে ডিক্রি করে নিল।উপেন ভূমিহীন ভিখারিতে পরিণত হল। জমিদারের বিলাসী লোভ এবং প্রজার জমির প্রতি সন্তানের মতো ভালোবাসা- এই দুই শ্রেণীর অর্থনৈতিক তথা মানবিক বিপরীত অবস্থানকে যাথার্থ দিয়েছে। কয়েকটি গদ্যগল্পে জমিদার-চাষীর দ্বন্দ্বের যে সত্য ছবি রবীন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন, কবিতায় লেখা এই গল্পে বাস্তবতার গভীরতা তার চেয়ে একটুও কম নয়। এই ধরনের গল্পে জমিদার রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র-পদ্যে বা গদ্যে শোষিত প্রজাদের সঙ্গে তাঁর শিল্পী হৃদয়কে রেখেছেন, যদিও এ সব লেখার সময়ে তিনি জমিদারী তদারকে প্রত্যক্ষত নিযুক্ত ছিলেন।

রবীন্দ্র গল্পে কৃষক-প্রজা নিদারুণ পীড়নের মুখেও যথেষ্ট প্রতিবাদী নয় ; ফলে লেখক দুঃখী প্রজাদের প্রতি শুধু কারুণ্য বর্ষণে দায়িত্ব শেষ করেছেন- তাতে আঁচ নেই যা জমিদারী ব্যবস্থাকে স্পর্শ করতে পারে। এরূপ অভিযোগ উঠতে পারে। তলিয়ে ভাবলে বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথ শোষক জমিদারদের মনে ধিক্কার জাগ্রত করেছেন। শুধু লেখকের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, লেখক কল্পলোকে বাস করেন নি বলেই প্রজাবিদ্রোহের স্বপ্ন আমদানি করেন নি। এবং সমাপ্তি বাক্যের শান্ত বিদ্রুপে-

তুমি মহারাজ, সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।

অনেকখানি ক্রোধ জমিয়ে রেখেছেন।

'দেবতার গ্রাস' বর্ণনার কল্লোলিত কবিত্বে এবং নাটকীয় বিক্ষোভের মিশ্রণে একটি উচ্চকণ্ঠ গল্প। বর্তমানে লেখাটির যাবতীয় শিল্পধর্ম আমার আলোচ্য নয়। সমাজ-বাস্তবতার বিচারে একে অবশ্যই আগের দুটি রচনার মতো সুলভ অভিজ্ঞতার সত্য বলে চিহ্নিত করা যাবে না, লেখার সময়ে বা আরও কিছু অতীতে ঘটনাকে স্থাপিত করলেও নয়। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনধারাই শুধু বাস্তব, অভিজ্ঞতা ও পরিচিতিই মাত্র সত্যের আধার-এরূপ সিদ্ধান্ত অশ্রদ্ধেয়। প্রায়ই-সর্বদা না হলেও, তা শুধু আপাত বাস্তব অনেক ঘটনা যা কদাচিৎ ঘটে, যাকে চিন্তাহীন মন আকস্মিক ও ব্যতিক্রমী মনে করে, তার মধ্যেই সমাজের গভীর পাপ, দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি প্রতিফলিত হয়।

'দেবতার গ্রাসে' ধর্মীয় কুসংস্কারের এক চূড়ান্ত নিষ্ঠুর সত্য ধরা পড়েছে। ধর্মান্ধ মানুষ যখন স্বার্থান্ধ হয়ে ওঠে, যখন তা উন্মাদ জনতার যৌথ প্রতিক্রিয়ায় আত্মপ্রকাশ করে তা ডাইনি বলে অসহায় আদিবাসীকে পুড়িয়ে মারতে পারে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নির্বিচার নরহত্যায় মত্ত হতে পারে অথবা রাখালের মতো বালককে সমুদ্র-দেবতার রোষশান্তির জন্য ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নদীবক্ষে ছুঁড়ে ফেলতে পারে।

তখন বিপন্ন মাঝি ডাকি কহে সবে,
'বাবারে দিয়েছ ফাঁকি তোমাদের কেউ-
যা মেনেছে দেয় নাই , তাই এত ঢেউ ,
অসময়ে এ তুফান। শুন এই বেলা.
করহ মানত রক্ষা; করিয়ো না খেলা
ক্রুদ্ধ দেবতার সনে।' .....
মাঝি কহে পুনর্বার, 'দেবতার ধন
কে যায় ফিরায়ে লয়ে এই বেলা শোন্।'
ব্রাহ্মণ সহসা উঠি কহিলা তখনি
মোক্ষদারে লক্ষ্য করি, 'এই সে রমণী
দেবতারে সঁপি দিয়া' আপনার ছেলে
চুরি করে নিয়ে যায়।' 'দাও তারে ফেলে,'
একবাক্যে গর্জি ওঠে তরাসে নিষ্ঠুর
যাত্রী সবে।.....
বলিতে বলিতে যত মিলি মাঝি-দাঁড়ি
বল করি রাখালেরে নিল ছিঁড়ি কাড়ি
মার বক্ষ হতে।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের আত্মহত্যার মধ্যে মানবী-বিবেকের খোঁজ করেন, অথবা তার পাপের প্রায়শ্চিত্তের ছবি আঁকেন।সব মিলে জনসংঘের নির্বোধ ধর্মীয় কুসংস্কারের উপরে যে কশাঘাত এই গল্প- তা সর্বকালে ছড়িয়ে পড়ে এবং লেখকের সমাজ-চৈতন্যের ব্যাপকতার নিদর্শন হয়ে থাকে।

ধর্মান্ধ কুসংস্কারের প্রতি বেদনাদীর্ণ ভর্ৎসনার গল্প 'বিসর্জন'। গঙ্গাসাগরে সন্তানবিসর্জনের পুরাতন প্রথা কথাগল্প তৈরিতে লেখকের মনে থাকা অসম্ভব নয়। জননী জাহ্নবীতে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে রুগ্ন এবং চিকিৎসার অতীত সন্তানকে গঙ্গায় বিসর্জন দিলে দেবী তাকে ফিরিয়ে দেন সব ব্যাধি দূর করে। এ-জাতীয় অপবিশ্বাস আমাদের সমাজের কোনো স্তরে আগে বা এখন প্রচলিত কিনা আমার তা জানা নেই। কিন্তু রোগ নিরাময়, বিঘ্নবিনাশ প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত শুধু অশিক্ষিত স্তরে নয়, শিক্ষিত জনের মধ্যেও ধর্মসংশ্লিষ্ট বিবিধ মূঢ়বিশ্বাস থেকে গিয়েছে। এখনও মন্ত্রপূত জলে, সন্ন্যাসী-পীরের তাবিজে, গুণি-ও ঝাড়ফুঁকে, পবিত্র কুণ্ডে অবগাহনে ফলপ্রাপ্তির আশা মানুষের। আলোচ্য গল্প তাই সেকেলে মনে হলেও আসলে সমাজ বাস্তবতার গভীর প্রতিবিম্ব। লোকমুখে দৈবীমহিমার নানা অলৌকিক কাহিনী ছড়ানো, লোকে তা সত্য বলে মানে। বিশেষ করে মানুষের স্নেহদুর্বল হৃদয়কে তা বশ করে। এভাবেই বিসর্জনের মা নিজ সন্তানের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কারুণ্যে সিক্ত করে গল্প পরিবেশন করেছেন। সংস্কারমূঢ়তাকে সেখানে আহত করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই অর্ধমৃত মাকে ক্রুদ্ধ আঘাত করার নির্মমতা লেখকের ছিল না। কারই বা থাকে ?

সেকারণে-এগল্পের আক্রমণের ধার কমে যায়নি। পুত্রঘাতী মা শিকারমাত্র। শিকারীকে খুঁজে তর্জনী তোলার সঠিক দায়িত্ব থেকে লেখক একটুও ভ্রষ্ট হন নি। লেখার কৌশলে ধর্মভিত্তিক কুসংস্কার ভেতর থেকে নগ্ন হয়ে পড়ে : তার প্রতি কারুণ্যভেদী মৌন অভিশাপ সোচ্চার হয়ে ওঠে।

তিন

বলাকায় ছন্দে একটা বড় ধরনের বাঁক অনলেন কবি। ছন্দের নিয়মিত *ফর্মাট* থেকে কথাবার্তার সহজমুক্তির দিকে এগোলেন খানিকটা। পরের কাব্যেই ছন্দের এই মুক্তিকে গল্প বলার কাজে লাগালেন। *পলাতকা* কাব্যটি প্রায় গল্প সংকলন হয়ে উঠল; ১৪-র মধ্যে ৯টি। বিষয়বস্তু একটি বাদে, একেবারে দৈনন্দিন জীবনের- পরিবার সমাজে জড়ানো। অনেক মেয়ের পরে আবার মেয়ে হলে মা-বাপের অবহেলা যার ভাগ্যে, কালো বলে বিয়ে হয় না যে মেয়ের, রাঁধা খাওয়ার পাকে বাঁধা যে বধূর জীবনে মৃত্যুই শুধু আনতে পারে মুক্তি- এদের দিকে বিশেষভাবে

তাকিয়েছেন লেখক। মধ্যযুগের আচার বিশ্বাসের বন্ধনটা এদেশের মেয়েদের জীবন ও ভাগ্যের চারধারে যে দ্বিগুণ হয়ে আটা, *বীরাঙ্গনার* কবি তাকে ভাবের উল্লাসে অনেককাল মুক্তি দেবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। *পলাতকার* কবি তাকে প্রত্যক্ষ ঘটনার মধ্যে ধরলেন। শেকলের গাঁঠগুলো ১৮৬২ থেকে ১৯১৮-অর্ধশতাব্দীতেও তেমন আলগা হয়নি।

পলাতকার একটি নিটোল গল্প 'নিষ্কৃতি', যার মূল লক্ষ্য সামাজিক ব্যঙ্গ, যদিও ভেতরে বিদ্রোহী *কমেডির* একটি স্তর আছে। কৌলিণ্যের অহমিকায় কাহিনীর সূচনা। মঞ্জুলির বিয়ে দেওয়া হল বৃদ্ধ বরের সঙ্গে। তারপরে অকাল বৈধব্যে নিক্ষিপ্ত বালিকার জন্য কঠিন কৃচ্ছ্রের নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা। পিতাই এখানে নিষ্ঠুর সমাজপতি। ধর্মীয় কুসংস্কারের সে রক্ষক। নিজে কিন্তু চূড়ান্ত আত্মসুখবিলাসী বালবিধবা কন্যার জন্য নিরম্বু একাদশীর ব্যবস্থা করে সে ভোজনবিলাসে মত্ত হয় এবং ঐ উপবাসী মেয়েকেই তার আয়োজন করতে হয়। এবং স্ত্রীর মৃত্যুর পরে বছর না পুরতে সে আবার বিয়ে করতে ছোটে। তার হৃদয়হীনতা পৌঁছেছে পীড়নের স্তরে। স্নেহমমতা বা বেদনাবোধের চিহ্নমাত্র না থাকায় বাবার চরিত্র অনেকটা অস্বাভাবিক মনে হয়। আসলে লোকটি মধ্যযুগবাহিত অপবিশ্বাসের এবং নারীপীড়ক শাস্ত্রাচারের এক প্রতিনিধিস্থানীয় রক্ষকমাত্র। তার ব্যক্তিস্বভাব নয়, তার মধ্যে একটা *টাইপের* চিত্র-রঙেরেখায় লেখকের ধারাল আক্রমণ। বাবার আচরণ সংলাপের ভাষা এই ব্যঙ্গ ও কশাঘাতকে ধরে রেখেছে গোটা কাহিনী জুড়ে। সামন্য নিদর্শন-মেয়ের কঠিন কৃচ্ছ্র নিয়ে লোভী ও ভোগী বাবার উক্তি :

গর্ব করি নেকো
কিন্তু তবু আমার মেয়ে সেটা স্মরণ রেখো।
ব্রহ্মচার্য রত
আমার কাছেই শিক্ষা যে ওর, নইলে দেখতে অন্যরকম হত।
আজকালকার দিনে
সংযমেরি কঠোর সাধন বিনে
সমাজেতে রয় না কোনো বাঁধ,
মেয়েরা তাই শিখছে কেবল বিবিয়ানার ছাঁদ।

বিধবা মেয়ে মঞ্জুলির বাল্যসাথী পুলিনকে বিয়ে করাটা পাঠকের কাছে মধুর বিদ্রোহ। মঞ্জুলিকে লেখক যত্ন করে এঁকেছেন। সে নীরব সংযমে দুঃখবরণ করেছে, বৈধব্যের সংস্কারে চিত্তকে বন্দী রেখেছে, হৃদয়ের প্রণয়ের বিকাশ অনুভব করে সে লজ্জিত হয়েছে। তারপর বাপ যখন কলপ মেখে পাকা চুল কালো করে

বিয়ে করতে ছুটল এবং এও যে শুধু ধর্মরক্ষার জন্য মেয়েকে তা বোঝাতে চাইল, মঞ্জুলির কাছে বাবার বা সমাজের মুখোশটা খুলে কুৎসিত ভণ্ডামি বেরিয়ে পড়ল। মঞ্জুলি পুলিনকে বিয়ে করে হৃদয়ের-মনুষ্যত্বের দাবি মেনে নিল।

'নিষ্কৃতি 'মেয়েদের চিত্তমুক্তির কাহিনীও বটে।

চার

পলাতকার পরে গদ্যগল্প *লিপিকা*। আরও কিছুকাল পরে *পুনশ্চ*তে যখন গদ্যছন্দ প্রতিষ্ঠিত হল, কবিতার প্রকাশশক্তির এই নতুন উপলব্ধি গল্পলেখায়ও জোয়ার আসল। *শ্যামলী* কাব্য পর্যন্ত ১৯৩২ থেকে ৩৪-এর মধ্যে গল্প লিখলেন ২৯/৩০ টি। কয়েকটি ভক্তকথা। কিন্ত ভক্তিবাদও নতুন মাত্রা পেল *কথা ও কাহিনীর* সমশ্রেণীভুক্ত গল্প কবিতাগুলির তুলনায়। আগের কথাগুলিতে ভক্তিধর্মের যে মহিমা তা সাধারণ ধরনের। *পুনশ্চ*তে সরাসরি জাতপাতের ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ; মাঝে-মাঝেই বিপ্লবী প্রত্যয়ও উচ্চারিত। 'শুচি', 'মুক্তি', 'রঙরেজিনী', 'স্নান সমাপন', 'প্রথম পূজা' প্রভৃতি লেখায় অন্ত্যজ মানুষকে ধর্মপথের দিশারী বলে ঘোষণা করার দুঃসাহস দেখানো রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে।অতীতে স্থাপিত হলে এ গল্পগুলি একান্তই বর্তমানের-এদের সমাজিক প্রাসঙ্গিকতায় সন্দেহ নেই।

একালের কাহিনীগুলি প্রেম, বাৎসল্য, স্মৃতির বেদনা, দারিদ্র্য, দুর্ভাগ্য প্রভৃতি নানা *থিমের* কেন্দ্রে গড়ে উঠেছে। বিশেষভাবে এসেছে সেই সব বালকবালিকার গল্প যারা একটু স্বতন্ত্র বলে সংসারে অবহেলিত বা নিন্দিত। আর কিছু মেয়ের কথা -গুরুজনের কঠিন শাসনে, খ্যাতির মোহে, অন্য নারীর মোহে বা হৃদয়হীনতায় প্রেমিকেরা যাদের প্রতারিত করেছে। 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি,' 'সাধারণ মেয়ে,' একটু জটিলভাবে 'দুর্বোধ' প্রভৃতি। নতুনত্ব, এই পর্যায়ের নারী অপমান শয্যা ছেড়ে বীর্যে ব্যক্তিত্বে সমুন্নত। আবার কোথাও অসবর্ণ বিয়েতে গৃহকর্ত্রী-মাতার নিষেধ অমান্য করে যুবকের উজ্জ্বল বিদ্রোহ।

এর মধ্যে অন্য ধাতুর একটি গল্প বিশেষভাবে চোখে পড়ে। *শ্যামলী* কাব্যের 'অমৃত'। লেখক দানা-বাঁধা একটি গল্পই বলেছেন কবিতার ভাষায়। গল্পের 'আমি' ধনীর মেয়ে অমিয়াকে ভালোবাসলেও মেয়ের বাপের লক্ষ ছিল লক্ষপতির ঘরের দু-একটি ছেলের দিকে।।'আমি' কিন্ত চাইল না প্রেমের জোরে নায়িকাকে সম্পদের বন্দীশালা থেকে উদ্ধার করতে। তার ছিল হীনমন্যতা, প্রেমের জোর যতটা মুখে ততটা চিত্তে ছিল না। সে অনেক ধনী হয়ে অমিয়ার যোগ্য হতে চাইল।ধনী হবার এই লোভকে সে ঔপনিষদিক অমৃত সাধনার বাগাড়ম্বরে ঢাকতে চেয়েছিল বলে লেখক কিছুটা বক্র কটাক্ষে তাকে বিদ্ধ করেছেন। এই 'আমি' অবশ্য আক্রমণের

পাত্র হতে পারে না। কিন্তু লেখকের সমাজচৈতন্য আমিতে নয়, অন্যত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন।

গল্পের দ্বিতীয় নায়ক মহীভূষণ কি মন্ত্রে ধনমূল্যের বিশ্বজোড়া অমানবিক প্রভাবের গোড়া ঘেঁষে কোপ লাগাল ? আরও ধনী হয়ে ধনসর্বস্ব সমাজের মুখে লাগাম পরানো যায় না।ওর শিকড়ে টান দেওয়া চাই। তাই লেখক তাকে বলেছেন 'কক্ষছাড়া পাগলা জ্যোতিষ্ক'।কিন্তু এ একটা ভাবের কথা। এখানে না থেমে তিনি আরও স্পষ্ট করে যুবকের পরিচয় দিয়েছেন :

> আট বছর য়ুরোপে কাটিয়ে মহীভূষণ ফিরেছেন দেশে
> বাবা বললেন,'বিষয়কর্ম দেখো।'
> ছেলে বললে, 'কি হবে।'
> লোকে বললে, ওর বুদ্ধির কাঁচা ফলে ঠোকর দিয়েছে
> রাশিয়ার লক্ষ্মী-খেদানো বাছুড়টা।

এই লক্ষ্মী কুবের-জাতীয় ; আধুনিক ভাষায় একেই বলে পুঁজিতন্ত্র। আর পুঁজিকে যারা লক্ষ্মী ভাবে, *বলশেভিজমকে* তাদের পক্ষে বাছুড় মনে করাই স্বাভাবিক।

১৯৩৬-এর এই লেখায় প্রথম দেখা মিলল এক পুরোদস্তর কমিউনিস্ট চরিত্রের।। রবীন্দ্রনাথ তার চোখে ভবিষ্যৎ দেখেছেন :

> অল্প বয়সের যুবা, চিনি নে তাকে,-
> কয়লায় আঁকা কাঁচকড়ার ফ্রেমে বাঁধানো-
> ফলাও তার কপাল, চুল আলুযালু,
> চোখে যেন দূর ভবিষ্যের আলো,
> ঠোঁটে যেন কঠিন পণ তালা'-আঁটা।

অমিয়াকে মহীভূষণ নিয়ে এসেছিল 'যেখানে ওর কাজ'। আনুষ্ঠানিক বিয়ে সম্ভবত হয় নি, কারণ মহীভূষণ বলেছিল 'কী হবে।'অমিয়ার হাতে যদিও দুগাছি শাঁখা ছিল। ওর কাজটা কি - স্পষ্ট নয় গল্পে, তবে দরিদ্র জনসাধারণের কাছাকাছি হবার সাধনা-এটা বোঝা যায়। তার একান্ত পরিচিত দেশী রীতি আছে-গ্রামে স্কুল চালানো, সেলাই শেখানোর ইঙ্গিতও আছে। রবীন্দ্রনাথের পল্লীসেবা-জনসেবায় আদর্শ

কমিউনিস্ট কার্যক্রমের উপরে খানিকটা আরোপিত। হয়ত ট্রেড ইউনিয়ন কৃষক সংগঠনের কমিউনিস্ট পদ্ধতি লেখকের অজানা ছিল। তাতে সত্যে খাদ মেশেনা। বাংলার প্রথম যুগের কমিউনিস্টদের স্বাভাবিক আশ্রয় ব্রিটিশের জেলখানায় মহীতোষের স্থাননির্দেশ করেছেন।

মহীতোষের ব্যক্তিত্বের জোরে যে মহিমা প্রতিষ্ঠিত তাতে লেখকের সমাজচৈতন্যের এক বিস্ময়কর প্রতিফলন ঘটেছে। এমন কি ঔপনিষদিক সাধনার এক প্রধান ভাষ্যকার রবীন্দ্রনাথ একজন কমিউনিস্টের জীবনদর্শনে অমৃত সন্ধান অনুভব করেছেন। পাঠক লক্ষ্য করুন নায়িকা অমিয়ার শান্ত সংযত সিদ্ধান্ত:

উপকরণের দুর্গ থেকে তিনি করেছেন আমাকে উদ্ধার,

শাস্ত্রবিরোধী এই ভাবনা রবীন্দ্রমননের এক অভিনব দিগদর্শন।

পাঁচ

১৯৩৭- যে লেখা *ছড়ার ছবি*। 'ভূমিকা'য় লেখকের মন্তব্য, 'এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্য লেখা .... এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ ...।'

অর্থ বহু-পরিচিতির ফলে একালের ছেলেদের কাছে দুরূহ নাও হতে পারে,যদিও কোনো কোনো গল্পের তাৎপর্য বয়স্কদের কাছেই শুধু গ্রাহ্য।

'সুধিয়া' সমরু গোয়ালার গরু। সে যখন ভিন গাঁয়ে কুস্তির পাল্লা দিতে গিয়েছিল, শেঠ দুনিচাঁদ বেনে সুধিয়াকে দেনার দায়ে ডিক্রি জারি করে নিয়ে গেল। ফিরে এসেই সমরু ভোজালি হাতে ছুটল দুনিচাঁদের কাছারিতে।সুধিয়া বলে হাঁক ছাড়তেই গোরুটা ছুটে এল সমরুর কাছে। সে বলল, 'মহাজনের টাকায় দুনিয়া কেনা যায়, কিন্ত সুধিয়াকে নয়। সুধিয়া তার নিজের মালিক,বাজারের পণ্য নয়। যদি নিজের ইচ্ছায় থাকে তো থাক, আর সমরুর সঙ্গে যেতে চাইলে কে রুখবে। তখন

চোখ পাকিয়ে কয় দুনিচাঁদ, 'পশুর আবার ইচ্ছে!
গয়লা তুমি, তোমার কাছে কে উপদেশ নিচ্ছে।
গোল কর তো ডাকব পুলিস।' সমরু বললে, 'ডেকো।
ফাঁসি আমি ভয় করিনে, এইটে মনে রেখো।
দশবছরের জেল খাটব, ফিরব তো তারপর,
সেই কথাটাই ভেবো বসে, আমি চললেম ঘর।'

মহাজনের শোষণ-পীড়ন-অর্থবলকে ভোজালি হাতে গায়ের জোরে রুখে দিল গরীব গোয়ালা সমরু, শ্রেণীযুদ্ধের বীজ এতে বোনা হল। এর সঙ্গে উচ্চারিত হল ধনভিত্তিক সমাজের কেন্দ্রীয় মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-সব কিছু টাকায় কেনা যায় না।

'মাধো' গল্পে জমিদারী পীড়নের চেহারাটা আলাদা। বালক মাধো জমিদারের স্যাকরার ছেলে। তার বিবাদ হল জমিদার-নন্দন দুলালের সঙ্গে। দুলাল যখন অকারণেই চাবুক মারতে গেলে তার পোষাকুকুর বটুকে, মাধো চাবুক কেড়ে নিয়ে ভেঙ্গে টুকরো করে ফেলে দিল। এই অপরাধে ব্যবস্থা হয়, মাধোকে বেঁধে হাটের মধ্যে ফেলে দুলাল চাবুক পিটাবে। মায়ের সাহায্যে বাড়ি থেকে চিরদিনের জন্য পালিয়ে যায় মাধো।

পাটকলের সর্দার কুলী হিসেবে তাকে পাই জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে। বাজার খারাপ হতেই মজুরদের মাইনে কমাল ইংরেজ মালিক। মজুরেরা করল ধর্মঘট। সর্দার কুলী মাধোকে সাহেব বুদ্ধি দিল ধর্মঘটীদের থেকে তফাৎ থাকতে। ভয় দেখাল। মাধো উত্তরে বলল, 'মরাই ভালো এ বেইমানির চেয়ে।'মজুরদের উপরে অত্যাচারের প্রতিবাদে সে চাকরি ছেড়ে চলে গেল।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যগল্পেও যা নেই এ কাহিনীতে সেই শ্রমিক-ধর্মঘটের সংক্ষিপ্ত কিন্তু বাস্তব বিবরণ আছে। আছে মজুরদের দল ভাঙানোর অপচেষ্টা, মালিকের পক্ষ হয়ে পুলিসের মজুর পীড়ন :

> এমন সময় নরম যখন হল পাটের বাজার
> মাইনে ওদের কমিয়ে দিতেই মজুর হাজার হাজার
> ধর্মঘটে বাঁধল কোমর : ....
> শেষকালেতে পুলিস নামল , চলল গুঁতো গাঁতা :
> কারো পড়ল হাতে বেড়ি,কারো ভাঙল মাথা।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অস্বচ্ছতা ছিল না। তিনি অনায়াসে ইংরেজ মালিকের শোষণ এবং দেশী জমিদারের পীড়নকে এক পক্ষে রেখেছেন।

মাধোর স্বভাবেও নেই কোনো অস্বচ্ছতা। ব্যক্তিগত স্বার্থে সে স্বশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে নি। অবশ্য তার চাকরি ছেড়ে যাওয়া এক ধরনের প্রতিবাদ হলেও সংগ্রামী মনের পরিচয় নয় -এরূপ অভিযোগ হতে পারে। কিন্তু তাকে শ্রমিক বিক্ষোভের বিপ্লবপন্থী নায়ক করে আঁকেন নি রবীন্দ্রনাথ। সে কারণেই লেখকের সমাজমনস্কতায় ঘাটতি আছে, এরূপ ভাবনা যান্ত্রিক বলে পরিত্যাজ্য। রবীন্দ্রনাথ

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পুথিপড়া ছাত্র ছিলেন না। তাঁর দীক্ষা জীবনের কাছে ; তাঁর বাস্তববোধকে কোনো *ফর্মুলার* ফ্রেমে ধরা যায় না বলেই তা এত স্বাভাবিক মানবিক এবং অকৃত্রিম।।

টীকা

১. গদ্যগল্প এর্বং কবিতায়-গল্প রবীন্দ্রসৃষ্টির এই দুইরকমের মিল অমিল, ভেতর ও বাইরের যোগাযোগ নিয়ে যে-সব বক্তব্য তা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয় হতে পারে।

২. আমি একথা বলছিনা যে গদ্যে এই ভাব প্রকাশ করা যেত না, করণ গদ্যের আগ্রাসী শক্তির প্রায় সীমা নেই। তবুও ছন্দোবদ্ধ কাব্যভাষা এ জাতীয় কাহিনীর প্রথাগত স্বাভাবিক মাধ্যম।